ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607001

আহসান হাবীবের কবিতা: একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ

সোহানা মাহবুব*

Abstract: Postcolonialism emerges as an evolved form of colonialism, characterised by a consciousness rooted in resistance against all ongoing modes of exploitation exercised by colonial powers. The eminent poet of the 1940s, Ahsan Habib, witnessed the aggression of two colonial regimes during his lifetime. This historical confrontation perhaps endowed him with a heightened sensitivity, enabling him to perceive how colonial forces strive to erase the indigenous culture, knowledge systems, and centuries-old traditions from the consciousness of the colonized. Such efforts result in the internalisation of a sense of inferiority and negativity toward one's own cultural identity. Through these mechanisms, the colonial ruling class proclaims its own culture, education, and civilisation as superior, thereby insidiously extending the destructive grip of colonization into the psyche of the subjugated.

Postcolonialism, therefore, identifies and interrogates the aggression, hegemony, and the eventual process of decolonisation experienced by the colonized populace. Ahsan Habib's literary consciousness reflects a desire to transcend the overwhelming dominance of colonial rule. In this process of transcendence, he seeks a return to the soil, culture, and the enriched historical legacy of Bengal. In times of colonial chaos, when individual existence is thrust into crisis, postcolonial literary expressions become a medium for reclaiming a defeated identity. Consequently, the construction of selfhood and the assertion of inner strength become central to the recovery process.

This paper aims to explore the extent to which colonial aggression left a deep imprint on Ahsan Habib's consciousness and, from a postcolonial perspective, to investigate whether his poetic voice undertakes the task of constructing an identity-based resistance against the dominant colonial discourse.

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুখ্যশব্দ: উত্তর উপনিবেশবাদ; উপনিবেশবাদ, উত্তর উপনিবেশবাদ এবং এর ইতিহাস; প্রতিরোধের বয়ান; চল্লিশের দশকের বাংলাদেশের কবিতা ও আহসান হাবীব; আহসান হাবীবের কবিতার উত্তর ঔপনিবেশিক পাঠ; ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদ থেকে উত্তরণ-প্রক্রিয়া ।

বাংলাদেশের চল্লিশের দশকের শক্তিমান কবি আহসান হাবীব (১৯১৭–১৯৮৫)। কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর তাঁকে একটি নয়, দুটো উপনিবেশী শক্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন সাধারণত ব্যক্তিচেতনায় অনপনেয় ক্ষতের জন্ম দেয়। একজন সংবেদনশীল কবি হিসেবে আহসান হাবীবকেও যে নিশ্চিতভাবে সেই ক্ষত বহন করতে হয়েছে, তাঁর কবিতায় গভীরভাবে এর প্রকাশ উপলব্ধ হয়। কবির পরিণত বয়সের রচনা *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ (১৯৮৫)* কাব্যের 'সেই অস্ত্র' কবিতায় তিনি দুটো বিশেষ অর্থবহ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেছেন, যার একটি 'জাত্যভিমান' এবং অন্যটি 'আধিপত্যের লোভ'। এই দুই শব্দের ভেতরেই রয়ে গেছে উপনিবেশবাদী শক্তির আগ্রাসী রূপের প্রকাশ। কবিতাটিতে তিনি এমন এক অবিনাশী অস্ত্র প্রত্যাশা করেছেন, যে অস্ত্র উত্তোলিত হলে ঘৃণা বিদ্বেষ অহংকার এবং জাত্যভিমান বার বার পরাজিত হবে, যে অস্ত্র আধিপত্যবাদের কর্তৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কবি মনে করেন সেই অবিনাশী অস্ত্রের নাম 'ভালোবাসা'। কবির এই আকাঙ্ক্ষায় উত্তর-উপনিবেশবাদী প্রতিরোধের বয়ান নির্মিত হয়ে যায়। এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট আহসান হাবীবের কাব্যসত্তায় ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য এবং জাত্যভিমান কতটা ক্ষত তৈরি করেছে তার তত্ত্বতালাশ এবং উপনিবেশবাদী কর্তৃত্বপরায়ণতার বিপরীতে বিকেন্দ্রায়িত পরিসর ও প্রতিরোধ নির্মাণে তাঁর কবিতা সচেষ্ট হয়েছে কি না, উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটির অনুসন্ধান।

উত্তর-উপনিবেশবাদ হলো উপনিবেশবাদের উত্তরিত একটি রূপ, যা ঔপনিবেশিক শক্তির সব ধরনের চলমান শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধজাত চৈতন্যের নাম। উত্তর-উপনিবেশবাদে মূলত উপনিবেশিত জাতিগোষ্ঠীর মননগত পরিবর্তনের সুলুকসন্ধানের পাশাপাশি উপনিবেশকসৃষ্ট সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা প্রতিরোধের বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সমালোচকের ভাষায়:

> এ-তত্ত্ব প্রাক্তন বা বর্তমান উপনিবেশে রচিত সাহিত্য পাঠ করা ও লেখার উপায় নিয়ে কাজ করে; সেই সাহিত্যে উপনিবেশকের (Colonizer) সংস্কৃতি কীভাবে উপনিবেশিতের (Colonized) ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিকৃত করে এবং উপনিবেশিতদের নিকৃষ্ট হিসেবে চিত্রিত করে, তা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিহ্নিত করতে চায়। এককালের উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বর ও ভঙ্গিমা এখন তার রচিত সাহিত্যে যেভাবে (ওই বিকৃতি এড়িয়ে) তার স্বতন্ত্র আত্মতা খাড়া করতে চায় এবং তার অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিতে অতীতকে

> নিজের জিনিস বলে দাবি করে, তা বুঝে দেখা এবং যথাযথ উপায়ে জোরদার করাও এ-তত্ত্বের জরুরি কাজ। (ফয়েজ, ২০০৬, পৃপৃ. ১৩-১৪)

উপনিবেশিক শক্তি একটি জনগোষ্ঠীর মানসজগৎকে উপনিবেশিত করে তোলে। আপাতদৃষ্টে, উপনিবেশিক শক্তির উপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়াকে প্রাথমিকভাবে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর কাছে নিরীহ বলে মনে হয়। কিন্তু, শিক্ষাবিস্তার, ধর্মপ্রচার কিংবা অর্থনীতিক সংস্কারের কথা বলে উপনিবেশিত দেশকে তারা মুলত শোষণ করে। উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর চেতনায় তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যের প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক হীনম্মন্যতাবোধ তৈরির মাধ্যমে নিজেদের সংস্কৃতি-শিক্ষা ও সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠতর প্রমাণের মধ্য দিয়ে সন্তর্পণে সম্প্রসারিত করে দেয় উপনিবেশায়নের করাল থাবা।

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ইউরোপের ব্রিটেন, হল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, পর্তুগাল এবং স্পেন পৃথিবীজুড়ে অনেকগুলো ভূখণ্ড দখল করে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেইসব জাতির অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে। তাদের মজ্জার ভেতর প্রোথিত করে দেয় প্রথম বিশ্ব-তৃতীয় বিশ্ব, কেন্দ্র-প্রান্ত, আমরা-ওরা নামক উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টের আরোপিত হীনম্মন্যতার বোধ। উত্তর-উপনিবেশবাদে কোনো একজন প্রভু থাকে না। এই প্রভু 'নামহীন, অবয়বহীন, সংখ্যায়ও একাধিক...তাই সংগ্রাম ও প্রতিরোধের পদ্ধতিও জটিল। এ উপনিবেশের প্রভু ভূখণ্ডের ভিতরে-বাইরে বিরাজমান।' (ফকরুল, ২০২১, পৃপৃ. ১১-১২) মূলত উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উত্তর-উপনিবেশী প্রতিরোধের চেষ্টা চলমান থাকে। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়:

> Who have been subjected to the colonization of their lands and cultures, and the denial of their sovereignty, by a colonizing society that has come to dominate and determine the shape and quality of their lives, even after it has formally pulled out (Smith, 1999, P. 7)

উত্তর-উপনিবেশবাদে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর ওপর ঔপনিবেশিক জাতির আগ্রাসন, আধিপত্য এবং সেখান থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করা হয়। এর বীজ রোপিত হয় উপনিবেশ স্থাপনের পরপরই শেকড়সন্ধিৎসু মানুষের একতাবদ্ধ প্রতিরোধ-চেষ্টার মধ্য দিয়ে। এডওয়ার্ড সাঈদের রাজনৈতিক গুরু একবাল আহমদ মনে করেন, তৃতীয় বিশ্ব বলতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, যা এই সমাজকে অনুধাবনের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই তাঁর মতে, এই সমাজকে উত্তর-ঔপনিবেশিক সমাজরূপে

চিহ্নিত করা প্রয়োজন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই তত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিকদের ভেতর হোমি কে. ভাবা (Homi K. Bhabha) (১৯০৯–১৯৩৬), আলবার্ট মেমি (Albert Memmi) (১৯২০–২০২০), ফ্রাঞ্জ ফানোঁ (Frantz Fanon) (১৯২৫–১৯৬১), এডওয়ার্ড ডব্লিউ সাঈদ (Edward Said) (১৯৩৫–২০০৩), গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক (জ. ১৯৪২) প্রমুখের নাম অগ্রগণ্য। এইসব তাত্ত্বিকেরা তাঁদের গ্রন্থে উপনিবেশক কর্তৃক প্রসারিত সাংস্কৃতিক তথা ভাষিক আগ্রাসন, উপনিবেশক ও উপনিবেশিতের সম্পর্ক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যকার বিভেদমূলক সম্পর্ক নির্ণয়, সংকর সংস্কৃতির জন্ম এবং উপনিবেশিত মানুষের পরিবর্তিত মনোজগৎ এবং তা থেকে উত্তরণে প্রতিরোধ ও বিদ্রোহকে চিহ্নিত করেন। বিশ শতকের আশির দশক থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্বটির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও সাহিত্যক্ষেত্রে এর প্রবল প্রকাশ নব্বইয়ের দশকে।

আফ্রিকার মতো ভারতবর্ষেরও ২০০ বছরের বেশি সময় ধরে উপনিবেশায়নের ইতিহাস আছে। প্রথম একশো বছর (১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পুনর্বিজয় (Recon), আক্রমণ (Invasion), দখল (Occupation) এবং আত্তীকরণ (Assimilation) এই চারটি ধাপে এবং পরবর্তী ৯০ বছর (১৮৫৭–১৯৪৭) প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে উপনিবেশায়ন চলমান রাখে। এরই ধারাবাহিকতায় ভারত, পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্রের জন্মের পর আরও ২৪ বছর পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ পর্ব চলমান থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'পৃথিবীতে যারা পরজাতির স্বাতন্ত্র্য লোপ করে, তারাই সর্বজাতির ঐক্য লোপ করে। ইম্পীরিয়ালিজম হচ্ছে অজগর সাপের ঐক্যনীতি; গিলে খাওয়াকেই সে এক করা বলে প্রচার করে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৯, পৃ. ৪৫১) মূলত গিলে খাওয়ার এই চলমান প্রক্রিয়াই উপনিবেশবাদী শক্তির আগ্রাসন। ফ্রাঞ্জ ফাঁনো এ বিষয়ে মন্তব্য করেন:

> We understand now why the black man cannot take pleasure in his insularity. For him there is only one way out, and it leads into the white world. Whence his constant preoccupation with attracting the attention of the white man, his concern with being powerful like white man, ... it is from whitin that the Negro will seek admittance to the white sanctuary. The attitude derives from the intention (Fanon, 2008, P. 36).

ভারতবর্ষে ১৯৪৭ সনে ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের অবসান ঘটলেও ৪৭ পরবর্তী কালে রক্তমাংসে ভারতীয় কিন্তু চিন্তায় মননে ইংরেজ হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের শিক্ষিত জনমানস। বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধ হয়েছে মেকলের শিক্ষাব্যবস্থায়, যেখানে তিনি ভারতীয়

শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিবর্তে ইউরোপিয়ান শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদলে এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি করতে চেয়েছেন, যাদের মজ্জা ও মনন থেকে অপসৃত করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে স্বসংস্কৃতি ও শিক্ষাকে। পরিবর্তে শেকড় ছিন্ন এক কেরানি শ্রেণির জন্ম দিতে চেয়েছে ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শক্তি, এবং এ কাজে তারা সফলও হয়েছে। এছাড়াও রেনেসাঁ, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার বিকাশও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবকেই মনে করিয়ে দেয়।

২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির করাল গ্রাস থেকে রাজনৈতিকভাবে ১৯৪৭ সনে মুক্তি ঘটলেও এই জনগোষ্ঠীর মনোজগতে উপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া চলমান থাকে। পূর্বের ক্ষত থেকে মুক্তি পাবার আগেই ১৯৪৭ সনে দেশভাগের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব পাকিস্তান আবার পশ্চিম পাকিস্তানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরও প্রায় ২৪ বছর প্রত্যক্ষভাবে আধা-ঔপনিবেশিক শাসনে গ্রস্ত হয়। এই দুই উপনিবেশিক শক্তির একটি প্রথমে অবিভক্ত ভারতবর্ষের ওপর এবং পরে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আগ্রাসন চালায়। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক শক্তির তাণ্ডব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষাও ভারতবর্ষের জাতিগোষ্ঠীর ভেতর থাকে পূর্ণ উদ্যমে চলমান। অবিভক্ত পূর্ব বাংলার জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে দেখা যাবে তখন তাদের ভেতর উন্মেষ ঘটছিলো বিপ্লববাদ এবং সাম্যবাদী চেতনার। ১৯৩০-এর এপ্রিলে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, তাঁর ফাঁসি, বিপ্লবতাড়িত বাংলায় ১৯৩১-এর দিকে যতীন দাসের প্রতিবাদী মৃত্যু, ১৯৪১-এ সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি গঠন ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে অবিভক্ত ভারতের পূর্ব বাংলাতেও গড়ে ওঠে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রচেষ্টা। সমালোচকের ভাষায়:

> আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সঙ্গে সমতালে ভারতীয় তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতি অঙ্গনে যে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার প্রকাশ তার মর্মকথা ছিল যুদ্ধবাজ আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দেয়াল তৈরি, সেই সঙ্গে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী তৎপরতার প্রকাশ ঘটানো।... তিরিশের দশকের শেষদিকে...বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যে মতাদর্শ-নির্বিশেষ সাংগঠনিক তৎপরতা সাংস্কৃতিক চেতনায় আলোড়ন সূচিত করে, তার নানামাত্রিক নান্দনিক প্রকাশ ঘটে চল্লিশের দশকে কবিতায়, গানে, নাটকে, ছোটগল্পে এমনকি উপন্যাসের মর্মবস্তুতে। ...ঢাকায় সত্যেন সেন, রণেশ দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র গোস্বামী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অচ্যুত গোস্বামী প্রমুখের উদ্যোগে স্থাপিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের শাখা। (আহমদ, ২০১৩, পৃ. ২)

কবি আহসান হাবীব জন্মেছেন ১৯১৭ সনে। কাজেই এই দুই উপনিবেশবাদী শক্তিরই (ব্রিটিশ এবং পশ্চিম পাকিস্তান) মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। সেই সূত্রে তাঁর কবিতা উত্তর-উপনিবেশবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে পাঠ করা যেতে পারে।

বিশ্বযুদ্ধের বিপন্নতা এবং ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে চল্লিশের দশকের কবি সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ প্রয়াসে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনার স্ফূরণ লক্ষ করা যাবে। ব্যক্তিক উজ্জীবন নয়, বরং চল্লিশের দশকের স্বভাবধর্ম নিহিত এর সংঘবদ্ধতায়, শ্রেণিসংগ্রাম-শ্রেণিচতনা এবং স্বদেশ-সমাজ-ঐতিহ্য ও ইতিহাসলগ্ন স্বকালচেতনায়, যা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সামষ্টিক প্রতিরোধকেই চিহ্নিত করেছে। তিরিশের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী কবিতার পরিবর্তে এই দশকের কবিতা অমলেন্দু বসুকথিত 'বহুর সাহচর্যে' উজ্জীবিত। চল্লিশের পাকিস্তান আন্দোলনের কাল থেকে ভাষা আন্দোলনের আগ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার কবিতার মূলধারা ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী কবিতার ধারা। সমালোচকের ভাষায়, 'প্রাক্ ভাষা আন্দোলন পর্বের কবিতার প্রধান সুর স্বপ্নাকাঙ্ক্ষা, মুসলিম ঐতিহ্যের স্মরণ, নতুনভাবে জেগে ওঠা, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলিম ঐক্য। এসব অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রাক্ পাকিস্তান পর্বে কবিরা পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন এবং কবিতাকে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ পরিগঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন।' (কুদরত, ২০২২, পৃ. ১২০) এই ধারা ছাড়াও ১৯৪০ থেকে ৪৯ কালপর্বে বাংলা কবিতার আরও একটি ধারা অব্যাহত ছিল, যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার পরিবর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মন্বন্তর, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, নতুন রাষ্ট্রগঠনের আশাবাদজাত সমকাললগ্নতা কবিতায় গ্রহণ করে। আহসান হাবীব দ্বিতীয় ধারার কবিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, যাঁর কবিতায় 'মানবতাবাদী দায়বদ্ধতার' (বায়তুল্লাহ্, ২০১৮, পৃ. ৯৭) কথা ধ্বনিত হয়েছে। সাতচল্লিশ পরবর্তীকালে পূর্ব বাংলার ভাষা-আন্দোলনকেন্দ্রিক আত্মপরিচয়গত সংকট তীব্র হয়ে উঠলে পাকিস্তানি আধা-ঔপনিবেশিক শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রবল হয়ে ওঠে। সমালোচকের ভাষায়:

> ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পাকিস্তান সরকার পূর্ববাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যকামী প্রয়াসকে স্তব্ধ করে দেবার অপপ্রয়াসে সুপরিকল্পিতভাবে লিপ্ত হয় – সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যাসাম্যে পরিণত করা করা, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করা, বাঙালি জাতিসত্তাকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানে ওপর নির্ভরশীল করে তোলা, সামরিক ও বেসামরিক শাসনের উচ্চপদে বাঙালিদের যথাযোগ্য প্রতিনিধিত্ব না-দেওয়া সে চেষ্টারই এক-একটি নিদর্শন। এভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণে ক্রমশ পূর্ববাংলা পাকিস্তানের কাঠামোর ভেতরে পশ্চিম পাকিস্তানের একটি আভ্যন্তরীণ উপনিবেশের রূপ লাভ করে। তার প্রতিরোধের প্রয়াসে এ-এলাকার জগণের স্বাতন্ত্র্যকামী চেতনা সংস্কৃতিকে ঘিরে ক্রমশ সংহত ও অন্তর্মুখী হয়ে পরিশেষে প্রবল জাতীয়তাবাদী শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। (সাঈদ-উর-রহমান, ২০১১, পৃ. ২৫)

মনে করা হয়, এই সময়টিই ‘পূর্ব বাংলায় নতুন বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা স্ফূরণের সময়। ...বাংলাদেশে কবিতার পুনর্জাত হবার, পুনর্গঠিত হবার প্রস্তুতিকাল (কুদরত, ২০২২, পৃ. ১৪১)। স্বদেশ ও স্বকালের সংকটকে ধারণ করে তাঁরা এই কালে কবিতা লিখেছেন। ১৯৫২–১৯৬০ কালপর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে থাকা স্বপ্ন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নানা বঞ্চনা ও অপরায়ণের শিকার হয়ে হতাশায় পরিণত হয়। এ কালের ক্রমবিকশিত মধ্যবিত্ত, যারা পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাঁদের হাতেই ক্রমে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশের পেছনে উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর ওপর উপনিবেশিক শক্তির বঞ্চনা ও অপরায়ণের স্মৃতি গভীরভাবে স্মরণযোগ্য।

মনোজগতে ঔপনিবেশিক শক্তিকে শ্রেষ্ঠ এবং উপনিবেশিতকে নিকৃষ্টতার হীনম্মন্যতা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শেকড়-বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। বাঙালি নৃগোষ্ঠির রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতাকে কব্জা করে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী দু-দশক ধরে যে শোষণ-লুণ্ঠন চালায়, উপনিবেশিত পূর্ব পাকিস্তানে যে বৈষম্য-বিভাজন, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিভাজনের সূত্রপাত ঘটায়, ১৯৭১-এ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর হৃত ক্ষমতার পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে বাঙালি নৃগোষ্ঠির রাজনৈতিক মুক্তি ঘটে। সমালোচকের মতে, ‘ঔপনিবেশিক শক্তি এমনভাবে শাসন করেছে যে উপনিবেশগুলো একদিকে যথাযথভাবে স্বশাসনের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি; অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শাসক বা নতুনভাবে সৃষ্টি হওয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এখনও প্রাক্তন উপনিবেশগুলোকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে’ (মাসুদুজ্জামান, ২০২২, পৃ. ৬৩)। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটলেও পশ্চিম পাকিস্তানি উপনিবেশকের এবং পরবর্তীকালে উপনিবেশকশাসকপুষ্ট বুর্জোয়া পুঁজিপতি তাদের পুঁজিসংগ্রহ এবং দেশীয় অর্থনীতি ধ্বংসকরণের মধ্য দিয়ে অধস্তন জনগোষ্ঠীর ওপর শোষণ প্রক্রিয়ার কাঠামোটি অব্যাহত রাখে। এইরকম একটি শোষণ-কাঠামোর মধ্যে কবি আহসান হাবীবের আবির্ভাব।

আহমদ রফিকের মতে, মৃদুভাষী, আত্মমগ্ন ও ভাবুক প্রকৃতির আহসান হাবীব চল্লিশের দশকে মানবতাবাদী কবিতা-ধারার অন্যতম রূপকার। আত্মলীন এই কবি যদিও রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, তবু তাঁর সম্পাদক সত্তা এবং চল্লিশের টালমাটাল সমাজ ও সময় তাঁর কবিতাকে সমকাললগ্ন করে তুলেছে। সমালোচক মন্তব্য করেন:

> আহসান হাবীবের কবি চরিত্রের একটি দিক লক্ষ করে অবাক হয়েছি যে, প্রচলিত অর্থে তিনি বিশেষ কোনো শিবিরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। ছিলেন না নির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক গোষ্ঠীভুক্ত কবি-সাহিত্যিকদের সহযাত্রী। এমনকি রাজনৈতিক

> মতাদর্শের প্রকাশেও তাঁকে কখনও প্রগলভ হতে দেখিনি, বরং একধরনের নির্বিকারত্ব বজায় রেখে চলাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও সমাজচেতনার শিকড় যে তার শিল্পীসত্তার গভীরে প্রথম থেকে অবস্থান নিয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল, তার কবিতাই সেই প্রমাণ বহন করে। (আহমদ, ১৯৯৫, পৃ. ষোলো)

রাত্রি শেষ কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে। চল্লিশের কালপরিসরে রচিত এই কাব্যটি আহসান হাবীবের 'আত্ম-অনুসন্ধানের পর্ব' (আহমদ, ১৯৯৫, পৃ. দশ)। কবিতাগুলো রচিত হয়েছে ১৯৩৮–১৯৪৬ কালপর্বে। এ কাব্যে যে বিষয়গুলো এসেছে, তার ভেতর 'বণ্টনবৈষম্য', 'সামাজিক অসাম্য', 'পরাধীনতা' এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম' ও 'মহাযুদ্ধ' মূল বিষয়। চারটি ভাগে বিভক্ত এই কাব্যে সমাজ-সমকাল ও স্বদেশভাবনার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক চেতনারও স্ফূরণ ঘটেছে। যে সময়পর্বে তিনি *রাত্রি শেষ* কাব্যটি রচনা করছেন, সেটি ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে রাজনৈতিকভাবে মুক্তির কাল। তবু এই কালপর্বকে তিনি দেখলেন 'বিকলপক্ষ পাখির মতো বন্ধ্যা মাটির ক্ষীণ বিন্দুতে ঘূর্ণ্যমান' (দিনগুলি মোর/ *রাত্রি শেষ*)। অনুভব করলেন 'অনাদি কালের বন্ধন আর বঞ্চনা' (এই মন–এ মৃত্তিকা/ *রাত্রি শেষ*) ব্যথা। এ কাব্যের কোথাও কোথাও এলিয়টীয় ঊষরতার প্রভাব পরিলক্ষিত। (দিনগুলি আজ জরতী রাতের দুঃস্বপন,/চির দহনের তিক্ত শপথ করে বহন!/ (দিনগুলি মোর/ *রাত্রি শেষ*)। 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়'। [এই মন–এ মৃত্তিকা/ *রাত্রি শেষ*]) প্রথম কাব্যগ্রন্থ থেকেই আহসান হাবীবের কবিতায় উপনিবেশবাদী শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়বার আকাঙ্ক্ষার অনুরণন মেলে– 'থাকতে কি চাও নির্বিরোধ?/রক্তেই হবে সে ঋণ শোধ।/নীড় প্রলোভন নিরাপদ নয় বোমারু বিমান আকস্মিক/ আরব্ধ গান এইখানে শেষ আজকে আহত সুরের পিক।' [আজকের কবিতা/ *রাত্রি শেষ*]) 'অরণ্য', 'ঝরা পালকের ভস্মস্তূপ', 'বালুর চর' কিংবা 'কৌটিল্যের কণ্টকময় ধূসর বন' ইত্যাদি শব্দবন্ধ চল্লিশ-দশকের টালমাটাল সময় ও স্বদেশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫), সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), দেশভাগ (১৯৪৭) উপনিবেশবাদের আগ্রাসন কবির চেতনায় এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। উপলব্ধি করা যাবে, হাবীবের এই মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতার জন্ম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে। সমালোচকের ভাষায়:

> প্রথমবার কবি যখন একবার তথাকথিত স্বাধীন দেশে আসেন, তখন এ দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে নতুনতর উপনিবেশবাদী পাকিস্তানি শোষকগোষ্ঠীর হাতে চলে গেছে। এদেশের সব মানুষ সেদিন স্বাধীনতা পেয়ে কবির মতোই হয়তো খুশি হয়েছিল...কিন্তু সে স্বপ্ন, খুশি, আনন্দ ভেসে যেতেও সময় লাগল না। এ বছরেই বাঙালি বুঝে নিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভেতরের আসল উদ্দেশ্য...তারপর ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র–১৯৫২ সনে সেই লুকানো কুৎসিত চেহারা আবারও প্রকাশিত হল–এবার

> সরাসরি রক্ত দিয়ে প্রতিরোধ–ফাটল ধরে গেল পাকিস্তানের এপার আর এগারোশ' মাইলের ব্যবধানের অবস্থিত ওপারের। ...(তুষার, ২০১৭, পৃ. ৪১)

১১০০ মাইলের এই ব্যবধান, এই বিচ্ছিন্নতার আর সমাপ্তি ঘটেনি। ক্ষমতার বদল ঘটল কিন্তু নতুন ক্ষমতাধারীদের আগ্রাসন পূর্বের উপনিবেশবাদী আগ্রাসনেরই সম্প্রসারিত রূপ বলে মনে হলো। ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেছে বলে আদতে মনে হলেও ব্যক্তির মানসজগতে বিদ্যমান উপনিবেশিক শক্তির অনপনেয় আঁচড় ও আগ্রাসনের ক্ষত যেন আহসান হাবীবের কবিতায় নির্মিত অস্থির সময়েরই বিনির্মাণ। বিকলাঙ্গ সময়ের চালচিত্র আরও গভীরভাবে নির্মিত হয় *ছায়া হরিণ* কাব্যে (১৯৬২), যেখানে ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেতে স্বদেশ-মৃত্তিকার কাছে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছেন কবি। 'এই কবিতাগুলি সেই সময়ের রচনা যখন সুকুমার মূল্যবোধের উপর রক্তাক্ত হাত রেখেছে বণিক সভ্যতা। অবক্ষয়ে, ঐশ্বর্যের আস্ফালনে, জোতদারের শোষণে, ক্লেদে আর কদর্যতায় সমাজ ছিল আবিল। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর ও নবতর স্বাধীনতার পর নানাবিধ জটিলতা কাব্যচেতনায় স্বাক্ষর রেখেছিল– এ কাব্যের কবিতাগুলো সেই অস্থির সময়ের জীবনভাষ্য' (দিলারা, ২০০২, পৃ. ৩৪)। মূলত, ইতিহাস ঐতিহ্য এবং মা ও মাতৃভূমিকে একাকার করে তুলবার এই আকাঙ্ক্ষা বিপন্ন সময়স্রোতে কবির আত্মপরিচয়ের ভিত নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা। ম্যাগি বাওয়ার্সের মতে, উত্তর-উপনিবেশবাদ হচ্ছে 'স্বাধীনতার পরে একটি জাতির পরিচয় পুনর্বিবেচনার একটি উপায়। বা এটি ঔপনিবেশিকতার ধারণা বিরোধিতা প্রকাশের একটি মাধ্যম হতে পারে (Bowers, 2005, P. 91)। শুধু রাজনৈতিকভাবে উপনিবেশক শক্তির আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেলেই বলা যায় না ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি মিলেছে। কারণ ব্যক্তির অন্তর্জগত উপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন মনস্তত্ত্বে বহন করে দীর্ঘকাল। ঔপনিবেশিক সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্বতা বা তার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মুছে ফেলে সেখানে রোপন করতে চায় নিজেদের সংস্কৃতির বীজ, প্রমাণ করতে চায় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব। উপনিবেশিত জনগোষ্ঠী এর বিপরীতে পুনর্নির্মাণ করতে চায় নিজের ঋদ্ধ অতীত, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির। উত্তর-উপনিবেশবাদী তাত্ত্বিকেরা এ প্রসঙ্গে মনে করেন, 'জাতীয় সংস্কৃতির অতীত অস্তিত্বের দাবি শুধু সেই জাতিকে পুনর্বাসিত করে না এবং ভবিষ্যৎ জাতীয় সংস্কৃতির আশাবাদের যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করে না। মানসিক ভারসাম্যের স্তরে তা স্থানীয়দের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে (Fanon, 1990, P. 169)। জাতীয় অস্তিত্ব পুনর্বাসনের বিষয়টি আহসান হাবীবের কবিতায় উঠে আসে। *ছায়া হরিণ* কাব্যের বেশ অনেকগুলো কবিতায় কবির ঐতিহ্যিক স্বর ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কোথাও তিনি ইতিহাস ঐতিহ্যের আলো জ্বালিয়ে রেখেছেন, কোথাও বা উপলব্ধি করেছেন গ্রাম বাংলার চিরায়ত জীবনের স্বর, যা কিনা এখন মুছে যেতে চাইছে (সে গেছে সে ভুলে গেছে,/ভুলেছে মোরগ-ভোর/ দুপুরে ধানের ছড়া কুড়োবার দিন;/ এখন এ-হাটে তার মন নেই/ পৃথিবীর হাটে হাটে/ এখন হাটুরে তার মন। ['জল পড়ে পাতা নড়ে'/ *ছায়া হরিণ*]), কোথাও বা ভাঙাচোরা দেয়ালের

পুরনো ইটের ভেতর ইতিহাস-লাবণ্যের আভা অনুভব করেছেন তিনি। (জীবন/*ছায়া হরিণ*) 'ইতিহাস' শব্দটি নানা মাত্রিকতায় *ছায়া হরিণ* কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। বাঙালির ঋদ্ধ ইতিহাসের এই পুনর্বাসন মূলত জাতীয় সংস্কৃতি পুনর্বাসনেরই আকাঙ্ক্ষা। 'হক নাম ভরসা' এবং 'ছহি জঙ্গেনামা' কবিতায় কবি শাসকশ্রেণির শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস মূর্ত করে তোলার মধ্য দিয়ে জমিদার ও ভূস্বামীদের মতো উপনিবেশিক শক্তির প্রতিনিধিদের তীব্র ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেন। এদের বিরুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ: 'পুরনো লাঙল আর কাস্তে হাতে লয়ে/ কসম খেয়েছি আর বলেছি হে ভাই,/ এস সবে, এইগুলো আবার শানাই।' ('হক নাম ভরসা'/ *ছায়া হরিণ*) অন্যদিকে 'ছহি জঙ্গেনামা' কবিতায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার চিত্র মেলে। কবির উচ্চারণ 'জানতো কে এ লড়াই মানুষের নয়/হাওয়ানের হানাহানি। এ পৃথিবীময়/ ছড়াবে আগুন এরা, লোভের আগুন। /বেকসুর মানুষেরা হয়ে যাবে খুন। (ছহি জঙ্গেনামা/ *ছায়া হরিণ*) এই হানাহানির লড়াই পৃথিবীময় ছড়িয়ে দেবার পেছনে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দায় ষোলো আনা। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি প্রসঙ্গত মনে পড়ে। তিনি লিখেছেন, 'য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয়মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১৯, পৃ. ৫১৩)।

সারা দুপুর কাব্যে সামাজিক বৈষম্য আর শ্রেণি বৈষম্যের চিত্র আরও গভীর হয়ে ওঠে। কবিতাগুলোতে উঠে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন-শোষণের অবসান না হবার ক্ষোভ। 'এই ঝড়ে অন্ধকারে' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেন কীভাবে উপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনে সবকিছু গ্রস্ত যায়, বিপন্ন হয় যূথবদ্ধজীবনের গান। (আমার/ সব গেছে,/ঘাটের ময়ূরপঙ্খী গেছে আর/ পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা ভাতে/ এখন বসে না কাক;) তবু কবির বেদনার্ত হৃদয় শেষ পর্যন্ত আশা রাখে জন্মভূমির প্রতি, অবিনশ্বর ঐতিহ্যের প্রতি। 'অভ্যাগত', 'মন বলে', 'আশা রাখি কেননা' কবিতাগুলোতে এর গভীর প্রকাশ মেলে। (তোমাতেই আশা রাখি আমার অবিনশ্বর জন্মভূমির/অমথিত অটল রূপের/আর তার অবিনশ্বর ঐতিহ্যের।' [আশার রাখি কেননা/ *সারা দুপুর*]) *রাত্রি শেষ* কাব্যে কবি নিপীড়িত মানবসত্তার একতার কথা লিখেছেন। উপনিবেশবাদ নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে গিয়ে যে একবাচনিকতাবাদের জগৎ গড়ে তুলতে চায়, উত্তর-উপনিবেশিক পাঠে আহসান হাবীব যেন তাকে ভেঙে দিয়ে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের বৈষম্যহীন একাত্মতাকে নিশ্চিত করতে চান। *রাত্রি শেষ* কাব্যে তিনি সংঘবদ্ধতার কথা লিখেছেন। (মৃত্যু), লিখেছেন সংগ্রামের রাজপথের কথা (স্বাক্ষর), যেখানে একবাচনিকতার পরিবর্তে বহুবাচনিকতার প্রকাশ লক্ষ করা যাবে। *ছায়া হরিণ* কাব্যেও তিনি বিশাল মানব-সমুদ্রে মিশে হয়ে উঠতে চেয়েছেন এক 'অনন্য ঢেউ'। (সমুদ্র অনেক বড়/ *ছায়া হরিণ*) তবে, এই ভাবনাগুলোর বিস্তৃত পরিসর নির্মিত হয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের কাব্যে। *সারা দুপুর* (১৯৬৪) কাব্য থেকেই তিনি কিছুটা জনবিচ্ছিন্ন। এই পর্বে শিল্পের দিকে আকৃষ্ট কবি কিছুটা অন্তর্মনস্ক। আইয়ুবীয় কালপর্বেসৃষ্ট বাকরুদ্ধতা ঐ কালের অন্য কবিদের মতো তাঁকেও হয়তো রূপকাশ্রয়ী

করে তুলেছে। টের পাওয়া যায় জনবিচ্ছিন্নতার বেদনাও। যাপিত নগরজীবনও এই বিচ্ছিন্নতার কারণ।

সারা দুপুর কাব্যে যে নগরের চালচিত্র মেলে, সেটি ইউরোপিয়ান কোনো নগরের আদলে রচিত বলেই মনে হয়। কারণ ঢাকা তখনো পুরোপুরি মেট্রোপলিটন নগরী হয়ে ওঠেনি। 'অভ্যাগত' কবিতায় বিজলী বাতির বোতাম, জেট, আয়রন্ডচুল তরুণী, জিপ, টোস্টার, অলিম্পিয়ার বাক্স ডিস্টেমপার্ড দেয়াল, ডাইনিং হল, ফ্রিজ কিংবা এরিয়েল পাখার ব্লেড, রেডিও, ফ্রেমে আঁটা পিকাসো ইত্যাদি নানা অনুষঙ্গ নাগরিক জীবনের আঘ্রাণ আনলেও কবিতার শেষে তিনি এইসব অনুষঙ্গকে আমলকি বাগানে পরিণত হতে দেখেন। মূলত, প্রকৃতিলগ্ন-গ্রামে ফিরে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষাই কবিমানসের এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার পেছনে সক্রিয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'নয়নচারা' গল্পের আমুর চেতনায় দুর্ভিক্ষপীড়িত যান্ত্রিক নগরীর কালো পিচের রাস্তা যেমন ময়ূরাক্ষী নদীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেরকমই হয়তো আহসান হাবীবের চেতনায় গ্রামে ফিরে যাবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই রূপান্তরকরণ ঘটায়। এসব কিছুই নস্টালজিয়া থেকে উদ্ভূত। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যগ্রন্থের 'আমার, আমার' কবিতায় বৃত্তাবদ্ধ, এলিয়টীয় নগরজীবনের প্রতিরূপের বিপরীতে সন্তর্পণে নির্মিত হতে থাকে তাঁর গ্রামে ফেরার আকাঙ্ক্ষা। *সারা দুপুর* কাব্য থেকেই মূলত কবির এই গ্রামে ফেরার আকুতি, নস্টালজিক সত্তার প্রকাশ উপলব্ধ হতে থাকে; সেই সাথে ফিরতে না পারার বেদনাবোধ। 'মন বলে' কবিতায় জনবিচ্ছিন্নতার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন বলেই মনে হয়। (...মায়ের শিথানে/ স্নিগ্ধ হাত রেখে বলি, মা এসেছি/...মন বলে যাই/ ছায়ার মিছিলে হেঁটে শান্তি নাই;/ যাই ফিরে যাই/... /যেখানে মানুষ মাঠ পথ পাখি পলাশ বকুল/ আরণ্য বর্ষার জলে পাশাপাশি গা ধোয়/ এবং /আদিম নদীর স্রোতে মানবশিশুরা/ খেলা করে;) এইসব জনবিচ্ছিন্নতার পেছনে তাঁর অন্তর্লীন মধ্যবিত্তমানসের গীতল সুরের অনুরণন টের পাওয়া যাবে।

আহসান হাবীবের কবিতায় মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ ঘটেছে। 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে আক্ষরিক অর্থেই ভারত পরিণত হয় ব্রিটিশ ভারতে।...তারা এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলে যারা কেবল ব্রিটিশদের অনুগত নয়, অধিকন্তু ব্রিটিশ শাসনের যৌক্তিকতাও মেনে নেয়। এই শ্রেণিটি হলো ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। ...এদেশের মাটি থেকে তার উদ্ভব হয়নি। ব্রিটিশরা এ শ্রেণির জন্ম দিয়েছিল ... কেবল নিজেদের অর্থনীতিক ও সাম্রাজ্যিক চাহিদ মিটানো 'বাবু' উৎপাদনের উদ্দেশ্যে' (ফকরুল, ২০২১, পৃপৃ. ৬৮–৭০) এই শ্রেণি জীবনজিজ্ঞাসাহীন, স্বার্থপর এবং ঔপনিবেশকশক্তির মদদপুষ্ট। *আশায় বসতি* কাব্যের প্রথম কবিতায়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন, নিরীহ-নির্বিবাদী-মনোরম কথার কাঙাল-সংসারী এক মধ্যবিত্তের পরিচয় মেলে, যিনি নৈঃশব্দ্যযাপনে সমস্ত শহর আর জনপদ প্রদক্ষিণে নিয়তিতাড়িত। বোদলেয়ার যাকে 'ফ্লনেরি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁর 'The Painter of Modern Life, and Other Esseys'

বক্তৃতায়, আহসান হাবীব হয়ত তাকেই 'নিশিলগ্ন নিঃসঙ্গ পথিক' বলে আখ্যায়িত করছেন। চল্লিশের দশকে আহসান হাবীবের সমাজলগ্ন উদাত্ত কণ্ঠ ষাটের দশকে এসে কিছুটা অন্তর্লীন, অন্তর্মনস্ক। ব্যক্তির একাকিত্ব, নৈঃসঙ্গ্য গীতলতায় নিবিড় (উত্তীর্ণ প্রহরের গান/ *সারাদুপুর*)। 'মরা নদী', 'বিষণ্ন সন্ধ্যা' আর 'ভেঙে যাওয়া হাটের নির্জনতা'য় সেই একাকিত্বের সৌরভ ভেসে আসে। তিনি নিজেও মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি বলে দ্বিধান্বিত, বেদনার্ত। তাঁর মধ্যবিত্তমানসও কখনও দর্শনের পুরনো মাদুরে নতুন বালি পেতে শুয়ে থাকা অভিজ্ঞ সংসারী প্রাণ স্বার্থমগ্নতায় বৃত্তাবদ্ধ ('নদীকে সামনে রেখে'/*আশায় বসতি*)। এছাড়া, *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যগ্রন্থের 'বেলুন' কবিতায়ও মধ্যবিত্তের বেলুনাবদ্ধ জীবনের কথা উঠে আসে, যে বেলুনের নাছোড় সুতোয় ঝুলন্ত জীবনের স্বাদ তারা জানে না। কিংবা 'কোনো কোনো শেষ রাত্রে' কবিতায় 'আমি স্থির আমার বৃত্তেই' পঙ্ক্তির ভেতরেও এই জীবনের অনুরণন টের পাওয়া যাবে। জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতার কথা প্রসঙ্গত মনে পড়বে, যেখানে কবি মশারিসদৃশ বৃত্তাবদ্ধতা থেকে বের হতে পারেন না আজীবন। এলিয়ট যেমন তাঁর *ওয়েস্টল্যান্ড* কাব্যে কলকারখানাফেরত বৃত্তাবদ্ধ মানবস্রোতের চিত্র এঁকেছেন, যাদের কোথাও কোনো গন্তব্য নেই, *আশায় বসতি* কাব্যের 'অসুখ' কবিতায়ও এরকমই সন্ত্রাসতাড়িত গন্তব্যহীন মানবস্রোতের দেখা মেলে। গন্তব্যহীন এই মানবস্রোত প্রসঙ্গে কোনো কোনো সমালোচক ষাটের দশকের সমাজবিচ্ছিন্ন, স্বেচ্ছাচারী তরুণ কবিদের কথা মনে করেন, যাঁরা সমকালে স্যাড জেনারেশন নামে পরিচিত। মূলত জনবিচ্ছিন্নতাই তাদের বিপন্নতার উৎস। ঔপনিবেশিক শক্তির অন্তর্ঘাত এবং বিচ্ছিন্নতার সংস্কৃতি যেন এইসব তরুণদের প্রাণশক্তি নিংড়ে নিয়েছে। (পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি/*আশায় বসতি*) কবির উচ্চারণ, 'স্বপ্ন পুষে কী লাভ কী লাভ' বলে তরুণ স্বাপ্নিক/ সংসারীর ক্ষিপ্রতায় বন্ধ করে জানালা এবং পিঞ্জর নামিয়ে রাখে মাটিতে,/ সে বলে / অতঃপর প্রত্যহের উনুনে নিশ্চিত সার্থকতা/.../ সারা ঘরে ভয় আর অবিশ্বাস নিজেই নিজের/ কণ্ঠনালী চেপে ধরে বলে, না না খুলবো না জানালা।/ 'খুলবো না জানালা' বলে সুচতুর সংসারীর/ যখন জানালা ছোঁয়, সজোরে দু'পাট এঁটে দেয়/ তখন সে দেখে/ হাতের আঙুল তাঁর এঁটে নিয়ে চতুর জানালা / কি নিখুঁত সাফল্যে রেখেছে তাকে ঝুলিয়ে,/ (পাখি পিঞ্জর ইত্যাদি/*আশায় বসতি*) এই ঝুলন্ত, দোলায়িত প্রাণ মধ্যবিত্তের। মূলত এ কালের মধ্যবিত্ত কেমন করে ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে স্বসত্তা ও সংস্কৃতি বিকিয়ে দিয়ে উপনিবেশবাদী আগ্রাসনের অংশ হয়ে ওঠে, কবি সেটিকেই চিহ্নিত করতে চান। এই ধরনের ব্যক্তিমানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা অন্যের মানবিক আর্তি শুনতে পায় না। *সারা দুপুর* কাব্যের 'কান্না নেই' কবিতায় সাজানো বাগানের বিনষ্টি আর আঁধারের তুফানে ঢাকা বিশ্বের মুখ কারো ভেতর এতটুকু ক্রন্দনের জন্ম দেয় না। মানুষের হৃদয়ের এই বর্বর গর্বের উত্তাপ কবিকে ভাবায়। বিমানবিকতার এই বিষয়গুলোও উপনিবেশবাদী আগ্রাসনেরই প্রভাব, যার সঙ্গে পুঁজিবাদী সভ্যতার গভীর যোগ অনুভূত হবে। সমালোচকের ভাষায়:

> শ্রমিক উৎপাদন ব্যবস্থায় আসার সঙ্গে সঙ্গে নিজের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। ... আত্মবিচ্ছিন্ন মানুষ ঐক্যের প্রকৃত অর্থ বোঝে না। মানুষ ঐক্যবদ্ধ না হোক অথবা মানুষ মনুষ্যত্ব হারাক এটা শাসকবর্গ চায়, তাই উৎপাদন ব্যবস্থার এই পর্বে শাসকের সাচ্ছন্দ্য যথেষ্ট। ... মানুষ-মানুষে পৃথক থাক সেটা শাসকবর্গ চাইবে, কিন্তু মানুষ-পণ্য-আসক্তি বা পণ্য-পণ্য সম্পর্ক পৃথক হলে শাসকবর্গের চলবে না। কিভাবে এই জায়গাটা ভরাট করা যাবে? অর্থাৎ এমন একটা মাধ্যম আবিষ্কার করতে হয় যেখানে...অর্থ সেই বিশ্বস্ত মাধ্যম। অর্থের আসক্তি অর্থের অভাব অর্থের আশঙ্কা মানুষকে মানসিকতাকে এমনি মোহাবিষ্ট করে যেখানে সে নিজের কথা অথবা অন্যের কথা ভাবতে ভুলে যায়। কাজ করব – টাকা পাব – খেতে পাব ...টাকার নেশা মানসিক জগতে অ্যালিয়েনেশনকে সম্পূর্ণ করে তোলে, অ্যালিয়েনেশনের সর্বোচ্চ সংজ্ঞা বাস্তব আকার পায় – Separation and Surrender. (পথিক, ১৯৯৩, পৃ. ৭০)

এই ‘Separation and Surrender’ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি। কীভাবে নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ভুলে আমরা ঔপনিবেশিক শক্তির পাগলাঘণ্টা শুনে সং-এ রূপান্তরিত হয়েছি কবি তার স্বরূপ রচনা করেন। ‘সং সেজে নেই সুখের সীমা/ নিজের আদল খুঁজলিনে (মায়ের ডাকের ছড়া/ *আশায় বসতি*) মধ্যবিত্তমানস কীভাবে স্বসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যিক আবহের পরিবর্তে উপনিবেশিক শক্তির তথাকথিত উৎকৃষ্ট সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে, কবিতায় তার প্রকাশ আছে। মধ্যবিত্ত মানুষের নিয়ন্ত্রিত জীবনের এই রূপায়ণের সঙ্গে উপনিবেশকালে রচিত ‘রিপ্রেসিভ বা দমনমূলক পাঠে’র অনুরণন অনুভূত হয়।

মূলত ইউরোপীয় পুঁজিবাদী শাসনের মধ্যে আধুনিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত, যার সঙ্গে থাকে সাম্রাজ্যবাদের ঘনিষ্ঠ যোগ। বিদেশি বণিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা এবং দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের ধ্বংস সাধনই উপনিবেশবাদী প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। একটি উপনিবেশবাদী শাসনকাঠামোর পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থায় জন্ম নেওয়া শ্রেণিবৈষম্য প্রবল বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়। ‘প্রাজ্ঞ বণিকের প্রার্থনা’ কবিতায় কবি গ্রিক মিথোলজি থেকে তুলে আনেন রাজা ‘মিডাস’কে, যাকে তিনি ধনতান্ত্রিক লোলুপ-সভ্যতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছেন; ভোগবাদ যার মূল লিপ্সা। বর্তমান সভ্যতার ধনতন্ত্র কীভাবে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং গভীর বিচ্ছেদের জন্ম দেয়, এই কবিতায় সেটি গভীরভাবে প্রকাশিত। শুধু এই কাব্যেই নয় *আশায় বসতি* কাব্যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কবি দেখাতে চেয়েছেন বিশ্বজোড়া মানুষ কেমন উন্মাদ বেচাকেনায় অশ্লীল হয়ে ওঠে, (যতবার এবং এবার/ *আশায় বসতি*) কিংবা ‘ক্ষুধার’ প্রতীকে দারুণভাবে পুঁজিবাদী যন্ত্রসভ্যতার করালগ্রাসে জীবনকে গ্রস্ত হতে দেখেন এভাবে: কি তার বিপুল দেহ/ ইটের পর ইট / সূর্যের সমস্ত মুখ ঢেকে যায়/ লোহায়-বিদ্যুতে প্রস্তরখিলানে গড়া/ এবং সে আসে/ নির্ভীক নিশ্চিত পায়ে/...একজন পলাতক এই মত্ত ভীড়ের পশ্চাতে/ খুঁজে ফেরে হারানো বাগান/ সরোবর ঘাস

ফুল।/ ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে /এই সব নিঃশেষে হারাতে নয় রাজি/ (সে আসে/ *সারা দুপুর*)। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'আসামী বিষয়ক', 'হত্যাই উদ্দেশ্য যদি' এবং 'এই তীর্থে' কবিতায় সামাজিক বৈষম্য এবং সামঞ্জস্যহীনতার বয়ান নির্মিত হয়। ফ্রাঞ্জ ফানোঁ মনে করেন উত্তর উপনিবেশবাদী সাহিত্যে ছড়িয়ে থাকে খারাপ সময়ের লক্ষণাবলি এবং দুঃখদুর্দশার চিত্র। মূলত উত্তর-উপনিবেশিক 'সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের প্রত্যক্ষ রূপ, প্রতিরোধের নানা চিত্র, উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার মুহূর্তের টানাপোড়েন, তৃতীয় বিশ্বের সাম্প্রতিক বিচিত্র পরিস্থিতি, জাতিগোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব, দারিদ্র্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, নারীর প্রতি সহিংসতা, বিশ্বায়নের প্রভাব, স্বৈরাচার ও সামরিক শাসনের সামগ্রিক ছবি মূর্ত হয়ে ওঠে' (মাসদুজ্জামান, ২০১৪, পৃ. ২১৫)। আহসান হাবীবের কাব্যে সামগ্রিক দুঃশাসনের (খারাপ সময়ের) চালচিত্র বিনির্মিত হতে দেখি। সামাজিক বৈষম্যের জন্য দায়ী ব্যক্তিবর্গ, যারা সমস্ত শোষণ-বৈষম্যের পথ প্রসারিত রাখে, অন্তরালের সেইসব অপশক্তির তৎপরতা কবির উচ্চারণে ধ্বনিতঃ '...এই বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত দরিদ্র দেশে/কারা সেই কালো দেয়ালের অসামান্য কারিগর কারা/ নিত্য নব আয়োজনে নব নব কৌশলে ক্রমশঃ /এমন দুর্ভেদ্য করে গড়ে তোলে দেয়াল কেবল/ সারি সারি কখনো কি প্রশ্ন করে দেখেছেন/ ফ্রান্স থেকে এইসব সুগন্ধী কি জন্য আসে এবং স্বদেশে/ ক্রেতা কেন তৈরী হয় কোন্/অলৌকিক সমাজ বিধানে আপনি আজীবন/ আমাকে আমার ফাঁদে বাঁধা জীবন-চক্রের/ চারপাশে বীরত্বের মহড়ায় সারাটা জীবন অর্থহীন আস্ফালনে কাটাবেন ...;' (আসামী বিষয়ক/ *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*) এই উচ্চারণে উপনিবেশের করাল থাবায় বন্দি মধ্যবিত্তের আক্ষেপ উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

আশায় বসতি (১৯৭৪) কাব্যকে উত্তর-উপনিবেশবাদী কাব্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। কাব্যটি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম কাব্য। স্বাধীকার আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্যোগময় দিনগুলোতে ১৯৭১-এর মার্চের আগের লেখা প্রায় সব কবিতা এই গ্রন্থের অন্তর্গত। এই কাব্যেই মূলত উপনিবেশিত বাঙালির হাতে নবনির্মিত প্রতিরোধের বয়ান রচিত হতে দেখা যায়। উত্তর উপনিবেশকালে রচিত যেসকল সাহিত্যে 'সাবভারসিভ এনারজিস' বা ধ্বংসাত্মক শক্তি নিহিত থাকে, সেইসব পাঠগুলোকে এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর কালচার এন্ড ইম্পেরিয়াল (১৯৯৪) গ্রন্থে প্রতিরোধের সাহিত্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের সাহিত্যে উপনিবেশবাদী শক্তির ইতিবাচকতা এবং তাদের প্রাধান্যকে ভেঙে ফেলে নিজেদের ঋদ্ধ ভুবনকেই তুলে আনা হয়। কারণ, 'শোষণ এবং অত্যাচারের বিশ্বস্ত চিত্র আঁকাই কোনো প্রতিরোধের সংস্কৃতির জন্য যথেষ্ট নয়। ...প্রতিরোধের সংস্কৃতির মূলকথা বঞ্চনার অবসানের বাণীর প্রকাশক এবং অপরিমেয় আশাবাদ।' (শাহেদ, ২০১২, পৃ. ২৪) ১৯৬৯-৭০ এবং ৭১ এর পরিপ্রেক্ষিতে রচিত কবিতায় ঔপনিবেশিক শক্তিকে প্রতিরোধের চিত্র দেখি *আশায় বসতি* কাব্যের কয়েকটি কবিতায়। (মিছিলের মুখ দেখো/ দেখো তার সারা মুখে দেখো/ দেশের আত্মার আভা [মিছিলে অনেক মুখ])। জাগ্রত মিছিলের প্রাণ যে আত্মরতির ঊর্ণাজালে আর মুখ

ঢেকে নেই, হয়ে উঠেছে দেশের আত্মার আরশি (ডাক/ *আশায় বসতি*) কবি সেটি উপলব্ধি করেছেন। যদিও *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* (১৯৭৬) কাব্যগ্রন্থে নতুন গন্তব্যে যাবার আকাঙ্ক্ষা ও আশাবাদ থাকলেও তিনি কোনো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না। 'স্বকালসমৃদ্ধ এক সুস্থির আবাস গড়বার আকাঙ্ক্ষা থেকে ভরাট এক ঋদ্ধ শানকির স্বপ্ন দেখলেও কবির সেই অন্বিষ্ট পূর্ণ হয় না। দূরের নদী হয়ে ওঠে কবির কাছে অনিঃশেষ এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যহীন। (কড়ি গুনতে গুনতে), ওকে ডাকো) কাজেই, ইট-কাঠ-পাথরের নগরজীবন ছেড়ে আদিগন্ত মেলায় প্রতীক্ষারত স্বজনের কাছে ফিরতে চাইলেও তিনি পারেন না। (আমি তা পারিনি) বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি, খুন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ– সবমিলে যুদ্ধধ্বস্ত স্বদেশের যে নৈরাজ্য কবিকে দগ্ধ করছে, তারই প্রতিফলনে স্বদেশকে তাঁর 'খর রৌদ্রময় জ্বলন্ত ময়দান' বলে মনে হয়। মূলত এটি তাঁর চৈতন্যে মুদ্রিত ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনের ক্ষত। মাতৃরূপে আবির্ভূত স্বদেশের ওপর নেমে আসা পুঁজিবাদী বণিকশ্রেণির আগ্রাসনেও তিনি গভীরভাবে বেদনার্ত। একালের স্বদেশ পরিণত হয়েছে এক বহুভোগ্যা নারীতে। উপনিবেশবাদী শক্তি উপনিবেশিত নারীর ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করে। একদিকে উপনিবেশক শক্তির পীড়ন অন্যদিকে উপনিবেশিত সমাজলগ্ন পিতৃতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য চালায়। নারী এভাবেই উপনিবেশবাদী আগ্রাসনে 'দ্বিগুণ উপনিবেশিত' (Double Colonised)। আহসান হাবীবের কাব্যে স্বদেশের মূর্তিরূপী নারী কোনো এককালে ছিল ঋদ্ধ নায়িকাপ্রতিম। কিন্তু বণিকের লোলুপ তৃষ্ণায় লুণ্ঠিত এই নারীর আজ সর্বাঙ্গ লাবণ্যহীন। শুরুর দিককার কাব্য থেকেই কবি শুনতে পান উপনিবেশবাদী তথাকথিত সভ্যতার শত শত চতুর দালালের লালসার পাশব লুণ্ঠনে দেশমাতার আর্তনাদ। (তনুর তনিমা ঘিরে আজ নেই হৃদয়ের ডাক/ কুৎসিত কঙ্কাল ঘিরে ইতিহাস-নগরী নির্বাক/ আসমুদ্র আকাশের একাগ্র প্রেমের পরিণতি/এক সুরে উৎসারিত পৃথিবীর প্রথম প্রণতি/ব্যর্থ আজ [ক্রান্তিকাল/ *ছায়া হরিণ*]) পুঁজিবাদী সভ্যতা পৃথিবীকে বহুভোগ্যা এক গণিকায় পরিণত করেছে। কবি উপলব্ধি করেছেন 'বলদর্পী বণিকের মানদণ্ড আনত।/ তোমার সর্বাঙ্গে সে রেখে গেছে পীড়নের বহু ক্ষত/ আরো জীবনের উদভ্রান্ত অশ্লীল বহু নিমিষের / ক্লান্ত মত্ততার জ্বালা/ সে জ্বালায় আজো তুমি জ্বলো! (যৌবনে জীবনে তুমি/ *ছায়া হরিণ*) কবির হৃদয়ও আজ 'মদালস সভ্যতার দ্বারে দ্বারে বিশুদ্ধ গণিকা।' (অন্যদিন/ *ছায়া হরিণ*) বেদনার্ত দৃষ্টিতে তিনি দেখছেন ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসনের চিত্র (অশ্লীল সেসব শো-কেস মৃতদেহের মত/ ক্রমাগত ফুলে উঠছে/...একধরনের স্নায়বিক রোগে তারা/ ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে/ আপনি জানেন কি? [সমীপেষু/*মেঘ বলে চৈত্রে যাবো*]) উপলব্ধি করেছেন অপসংস্কৃতির আগ্রাসন। একদিকে উপনিবেশবাদী শক্তির পীড়ন, অন্যদিকে, ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতিনিধি বণিকশ্রেণির লোলুপতায় স্বদেশ যেন দ্বিগুণভাবে উপনিবেশিত। এরকম বিপন্ন গ্লানিময় পরিস্থিতি থেকে কবি স্বদেশ-স্বকাল ও শেকড়বিচ্ছিন্ন সত্তার ক্লান্তি মোচনে শৈশব-কৈশোরের নস্টালজিয়ার কাছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। ('ফিরতে হবে', 'আমার যাওয়া হয়না', 'বেলুন')।

আহসান হাবীবের শেষদিকের কাব্যগুলোতে তিনি এই জনবিচ্ছিন্ন জীবন থেকে কৃষকজীবনে ফিরতে চেয়েছেন। আলেফ মুনশী, সখিনা, খালেক নিকিরি, ভুবন কামার, লক্ষণ মুচি, সারেঙ, তোরাবের ছেলে, ঈশ্বর গায়েন, সতী বেওয়া, কদমের মা, জমিলার মা কিংবা সুন্দরবনের সাহসী শিকারীর মতো রোদে পোড়া নিম্নবর্গ মানুষের সমবেত শক্তির প্রতি বিশ্বাস এইসব কাব্যে প্রগাঢ় স্বরে ধ্বনিত। তিনি উপলব্ধি করেছেন, ঔপনিবেশিক আধিপত্যের পতন ঘটাতে হলে প্রান্তিক মানুষের কথা বলতে হবে, তাদের অস্তিত্বশীল আত্মমর্যাদার উজ্জীবন ঘটাতে হবে। শ্রেণিবিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এদের ওপর পীড়ন বজায় রাখার সংস্কৃতি অব্যাহত রাখে উপনিবেশক শক্তি। নিম্নবর্গের প্রতি ঔপনিবেশিক শক্তির মনোভাব এরা অনুগত, নির্জীব এবং খণ্ডিত-পরাজিত সত্তা। এরকম একটি প্রকল্প নির্মাণ করলে এদের দমন-পীড়ন করা সুবিধাজনক। এদের উজ্জীবন না ঘটলে গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে নগরজীবনের বিচ্ছিন্নতা ঘটে। যেকোনো বিচ্ছিন্নতা কিংবা খণ্ডিত অবস্থার মধ্য দিয়েই উপনিবেশবাদী শক্তি সহজে তাদের শাসন প্রক্রিয়া চলমান রাখে। পরিশ্রুত সংস্কৃতি, আচার এবং অভিজ্ঞানের পুনর্নির্মাণই উত্তর উপনিবেশবাদী সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়। সেদিক থেকে আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় লোকসংস্কৃতির উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ভূমিলগ্ন থাকতে চান। আহসান হাবীবের কবিতায় নিসর্গপ্রীতি এক বিশেষ উপাদান। পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে কিংবা স্বদেশের মুখাবয়ব নির্মাণে কবি নিসর্গের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যে নিসর্গকে ধরে রাখবার জন্য কবির যে আকুতি, সেটি অসাধারণ। ঔপনিবেশিক আগ্রাসন নগরজীবন সম্প্রসারণে প্রকৃতির বিনাশসাধন করে। এর বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী ভাবনার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ইকোক্রিটিসিজম তত্ত্বে। ঔপনিবেশিক শক্তি যে প্রকৃতির ওপরও প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়, সেটি তার উপনিবেশক আগ্রাসনের অংশ। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যে আহসান হাবীবের গভীর আকুতি প্রকাশিত 'দোহাই তোমার' কবিতায় (দোহাই কেটো না/... স্বহস্তে নিশ্চিহ্ন করে নিজের ভুবন/...বলো ত বানাবে তুমি আর কোন্ নতুন ভুবন?/...সর্বগ্রাসী দানবনিনাদ/ যখন শরীর থেকে / তোমাকেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে/ সভ্যতার আহার যোগাবে/...যখন তোমার ক্লিষ্ট ক্লেদাক্ত ফুসফুস কিছু / সবুজ হাওয়ার জন্যে পাতবে বুক/ কে তোমার হাতে তুলে দেবে সেই/ অনন্য পাখাটি/ দোহাই কেটো না/ এই বটবৃক্ষ আর এই নিম ছাতিম জারুল/ পিতা কিংবা পিতামহদের ঋদ্ধ হাতের অনন্য বরাভয়/ বিলিয়েছে আশৈশব আমাকে তোমাকে)। কবিতার শেষদিকে কবি তাঁর প্রেয়সী প্রীতিলতার কথা লিখেছেন, যে নারী বকুলবৃক্ষ কেটে ফেললে যন্ত্রকম্পিত অচেনা নগরের আকাশচুম্বী-চিমনিময় পৃথিবীতে স্বস্তি খুঁজে পাবেন না, অস্তিত্বসংকটে নিপতিত হবেন। কবিতায় যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনে প্রকৃতির আসন্ন উচ্ছেদ নারীর অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তুলছে। (আমাদের সাধের বকুল কেটে ফেললে/এবং আকাশচুম্বী অট্টালিকা তুলে দিলে/ অথবা ধোয়াক্কার চিমনিময় বিশাল কারখানা তুললে/ আমি আর প্রীতিলতা তখন কোথায়/ মুখোমুখি বসবো বলো,/ এবং বকুলগন্ধবিহীন বাতাসে, এই /শুধু যন্ত্রকম্পিত এ অচেনা বন্দরে/.../কি ক'রে দু'জন দু'জনকে চিনে নেবো?) প্রকৃতি ও মানুষের

সহাবস্থান এবং নারী ও প্রকৃতির একাত্মতার পাশাপাশি তার উচ্ছেদ এবং নিগৃহীত সত্তার বেদনা থেকেই ইকোফেমিনিজম তত্ত্বের জন্ম। মানুষ পশু ইত্যাদি কবিতায়ও নিসর্গের ওপর নেমে আসা ব্যক্তিমানবের পাশবিকতার উল্লেখ মেলে। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে আবহমান বাংলার নিসর্গের ছবিতে উচ্চারিত হয়েছে উপনিবেশবাদী যন্ত্রসভ্যতার আগ্রাসনের বিপরীতে নিসর্গের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ('দু'পাশে ধানের শীষে শিশির টলমল, তুই/ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবি, তুই দু'হাতে সবজু টিয়ে ওড়াতে ওড়াতে/ যা সেই নদীর ঘাটে যা/ যে নদী প্রত্যহ যায় নিঘাট সমুদ্রে যায়/ ফিরে আসে ঘাটে।/ তুই/ টিয়ের পাখার রঙ হাতে মেখে নে/ দু'একটি ধানের শীষ সঙ্গে নিবি, আর/ রুপালি শিশির নিবি পায়ে গেঁথে, তোর/ আশৈশব স্বপ্নের বন্দরে যাবি। এর মধ্য দিয়ে তিনি যেন উপনিবেশোত্তর বয়ান নির্মাণ করতে চান।

শেষদিকের কাব্যগুলোতে আহসান হাবীব প্রবলভাবে উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বয়ান নির্মাণে সচেষ্ট। *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যের 'একুশ' নামক কবিতায় উৎসবসর্বস্ব একুশের পরিবর্তে কবি শহিদের আত্মত্যাগের বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। একুশের মতোই আমাদের আরেক অনন্য অর্জন একাত্তরের স্বাধীনতা। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো কাব্যে* একাত্তরের বেদনাগাঁথায় কবির গভীর উচ্চারণ (পবিত্র শোকের শবাধার/ দেখো ছুঁয়ে আছে বুক/ আর দেখো শবাধার ছুঁয়ে/ গুলিবিদ্ধ হাজার করোটি আছে নুয়ে [কাব্যের নির্ভুল সংলাপ])। ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় উপনিবেশিত জনগোষ্ঠীর যে কোনো অর্জনকে লুক্কায়িত রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়। উত্তর-উপনিবেশিকালে ঔপনিবেশিক শক্তির প্রেত হিসেবে যারা সক্রিয়, তারা এই ব্যবস্থা বজায় রাখতে চায়। সমালোচক মনে করিয়ে দেন, 'উপনিবেশ উত্তর সময়ে 'সাম্রাজ্যবাদী শাসক এদেশ থেকে চলে যাবার পরও বাঙালির নিজের বিশ্বাস, মিথ, আচরণ ইত্যাদি...অনৈতিক ভাবকল্পরূপে তার কাঁধে চেপে বসে আছে, এবং থাকবে। এ এক উত্তর উপনিবেশিক দুর্ভোগ' (সুবিমল, ১৯৯৬, পৃপৃ. ১৪৪–১৪৫)। উত্তর উপনিবেশবাদী সাহিত্য উপনিবেশবাদী প্রেতের এই অপচেষ্টা থেকে নিজের সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিনির্মাণ ঘটায়, যাকে বলা হয় 'reconsideration and revision of history' (Bowers, 2005, P. 94)। ঔপনিবেশিক আধিপত্য কায়েমের রাজনীতি নস্যাৎকরণ এবং আত্মপরিচয়ের ইতিহাস বিনির্মাণের বিষয়টি এখানে গভীরভাবে বিবেচিত হয়। *মেঘ বলে চৈত্রে যাবো* কাব্যের 'সার্চ', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি কবিতায় স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রত্যক্ষ রূপ এবং 'এখন আমার', 'কথা বলতে বলতে', 'খোকন ফেরেনি' কবিতায় পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের কথকতা নির্মিত হয়। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি শুধু নয়, আমাদের স্বাধীনতা ও স্বাধীকার অর্জনের গৌরবান্বিত ইতিহাস বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে আহসান হাবীব আমাদের বীরত্বগাথার অনুরণন পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত করতে চান। হাবীবের শেষদিকের কাব্যগুলোতে এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন:

> কীভাবে উপনিবেশকারী অধীনস্তর চিন্তাজগৎকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করে, কীভাবে তার 'উন্নত' সংস্কৃতির সুফল সম্পর্কে উপনিবেশিত মানুষকে অবহিত করা হয়। অতীত খনন করে তুলে আনে উপনিবেশকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাস ও গল্প-কাহিনী। ঔপনিবেশিকতাবাদ যেমন বিস্মৃতির (amnesia) প্রচেষ্টায় রত থাকে, উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদ তেমনি স্মরণের (anamnesia) সংস্কৃতি তৈরি করতে চায়। (হিমাদ্রি, ২০১২, পৃ. ৬২৩)

দু'হাতে দুই আদিম পাথর কাব্যগ্রন্থে (১৯৮০) কবি তাঁর ইতিহাসসচেতনতা, কালচেতনা এবং শাশ্বত বাঙালি জীবনবোধের খনন ঘটিয়ে তৈরি করতে চেয়েছেন সেই 'স্মরণের সংস্কৃতি'। এই কাব্যে তিনি যেন পৌঁছে গেছেন প্রকৃত স্বজনের কাছে। কবি এখানে ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক কালের সাম্যবাদী সমাজের মানুষ হিসেবে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে সচেষ্ট। পূর্বসূরিদের সঙ্গে এই অচ্ছেদ্য অনাদিকালের বন্ধন তিনি প্রসারিত করে দিতে চেয়েছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দিকে। পূর্বসূরির সঙ্গে উত্তরসূরির এই ঐতিহ্যিক যোগ ঔপনিবেশিক শক্তির আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিনাশ সাধন করবে বলেই তিনি বিশ্বাস করে উচ্চারণ করেন: মৃত্যুকে লঙ্ঘন করে বহমান ইতিহাসে যাই/এবং নিজেকে আমি বারম্বার পার হয়ে ইতিহাসে লগ্ন হই/ ব্যাপ্ত হই তোমাতে এবং তোমার স্বজনলোকে। ...আমি নই তুমিই আমার প্রতিবিম্ব। / আমি প্রস্তর অরণ্য আর ধাবমান হরিণের কাল পার হয়ে অবিশ্রান্ত তোমাতে ধাবিত।' (আমি আছি/ দু'হাতে দুই আদিম পাথর) এই কাব্যের 'আবহমান' কবিতায়ও ইতিহাসচেতনার প্রগাঢ় প্রকাশে উপলব্ধ হবে জীবনানন্দের অস্তচাঁদে কবিতার অনুরণন। অবিশ্রান্ত মানসভ্রমণের মধ্য দিয়ে তিনি যেন বিশ্ব-ইতিহাসের ঋদ্ধ সেকাল এবং আবহমান বাঙালির একালের মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে চান। পলেস্তারা খসা পুরানো সভ্যতার উৎসবে নতুন দীপাবলি জ্বালাতে চান, যে উৎসবে তাঁর গা ছুঁয়ে থাকবে তাঁর স্বজনেরা। এইসব স্বজনের সঙ্গে একদা তাঁর বিচ্ছিন্নতার কথাও মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে। 'ফিরে আসবে বলে' কবিতায় কবি নিজের সঙ্গে আবহমান গ্রাম বাংলার বিচ্ছিন্নতার কথা বলেন ('পারঙ্গম একজন' এবং 'গতায়াত প্রসঙ্গে' কবিতায়ও একই অনুষঙ্গ বর্ণিত।)। পঞ্চাশের শক্তিমান কবি আল মাহমুদের কবিতায়ও পাঠক গ্রামে ফেরার আকুতি অনুভব করেন। নগরজীবনাভ্যস্ত মানুষ কীভবে আজন্মলালিত নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে পড়েন, ক্ষুধাদীর্ণ নগরজীবনে কেমন করে ক্ষুধার অস্তিত্বজুড়ে শুধু ধানের উৎসবের স্মৃতিচারণ মূর্ত হয়ে ওঠে (ধান শুধু ধান এবং সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে) সেই ইতিহাসের বয়ান রচনা করেছেন কবি। নগরজীবনের এই নিতল নিঃসঙ্গ অসুখের শুশ্রূষা হিসেবে কবি যূথবদ্ধ গ্রামজীবনের উষ্ণ সান্নিধ্যকে অনিবার্য করে তোলেন। (কদমের মার শুকনো কুপিতে/ আলো জ্বালাবার স্বপ্ন ছিলো তোমার/ সেই স্বপ্ন ফিরে পেলেই নিঃসঙ্গতার জ্বালা তোমার দু'চোখ থেকে ঝরে যাবে। [সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে/ দু'হাতে দুই আদিম পাথর]) মূলত কবি বলতে চান যূথবদ্ধতা থেকে বিচ্ছিন্নতা বা শেকড় থেকে বিচ্যুতি ব্যক্তির ভেতর অস্তিত্বসংকটের জন্ম দেয়। এই অস্তিত্বসংকট উত্তরণেই তিনি আবহমান

বাংলার ঋদ্ধ অতীত ঐতিহ্যের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছুক। 'উত্তরে দক্ষিণে' কবিতায় আহসান হাবীব শিকারীর প্রতীকে বাঙালির পৌরুষদীপ্ত এক শক্তিমান সত্তার আদল তৈরি করেন, যার ভেতর আবহমান বাঙালি জাতির শক্তিমত্তার রূপাবয়ব নির্মিত হতে দেখা যায়। এই কাব্যেই তিনি নির্মাণ করেন জন্মান্ধ রাক্ষসের প্রতীকে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী আদল, দুর্জনরূপে ঔপনিবেশিক অপশক্তির লোভী-কদর্য লোলুপ সত্তা ('দাদাজান বলতেন' কিংবা 'নীল নক্সা', 'রে কিশোর')। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও শেষপর্যন্ত এই বিশ্বাসে উপনীত হন, ঔপনিবেশিক শক্তি শেষ পর্যন্ত নিজেই নিজের লোলুপতার ফাঁদে বিপন্ন হবে, গ্রস্ত হবে।

কাব্যের একেবারে শেষে 'আমি কোনো আগন্তুক নই' কবিতায় আধিপত্যবাদী ঔপনিবেশক শক্তির আগ্রাসন খর্ব করবার জন্যই বলিষ্ঠকণ্ঠে ইতিহাস-ঐতিহ্যঋদ্ধ হাজার বছরের বাঙালির সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগের বিষয়টি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করেন। এই বাংলায় তিনি যে কোনো অভ্যাগত নন, অনাত্মীয় নন, তিনি যে কোনো আগন্তুক বা বহিঃশক্তি নন, নন ভিনদেশী আধিপত্যবাদী উপনিবেশিক শক্তি। অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে আবহমান বাংলার ভূমিপুত্র হিসেবে তিনি তাঁর মৃত্তিকা-সংলগ্নতার পরিচয় নির্মাণ করেন। *সারা দুপুর* কাব্যে নগরজীবন থেকে গ্রামে ফিরে যাবার যে আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিলো, 'চলো যাই—আমরা ক'জন যুগের একান্ত ক'টি নাগরিক/ আলোটুকু ধরে রাখি হৃদয়ে এবং কুড়িয়ে সব ক'টি ধান/ সন্ধ্যার কয়েকটি নীল পাখির কাকলি/ ধরে রেখে ঐক্যতানে সারারাত কাটাবো/ এবং অন্ধকারে পায়ে পায়ে চিনে নিয়ে আদিম নদীর/ অক্ষয় ঘাটের সিঁড়ি টলমল জলের/ ধারা এনে এখানে বহাবো। হাতে হাতে/ সরাবো রাতের অন্ধকার...আদিম আবেগে দেখা দেবে ধানের মঞ্জরী, সেই ধান/ মুঠো মুঠো আমরা ছড়াবো সারা মাঠে (সূর্যসঙ্গ/*সারা দুপুর*) *দু'হাতে দুই আদিম পাথর* কাব্যে সেই আহবান নিবিড় বিশ্বাসে স্থির। এখানে তিনি আর কোথাও যাবার আহ্বান জানাচ্ছেন না। বরং স্থির বিশ্বাসে বলীয়ান, আত্মপরিচয়ে ঋদ্ধ। (হাত রাখো বৈঠায় লাঙলে, দেখো/আমার হাতের স্পর্শ লেগে আছে কেমন গভীর। দেখো/ মাটিতে আমার গন্ধ, আমার শরীরে/ লেগে আছে এই স্নিগ্ধ মাটির সুবাস।/ আমাকে বিশ্বাস করো, আমি কোনো আগন্তুক নই।/ দুপাশে ধানের ক্ষেত/ সরু পথ/ সামনে ধু ধু নদীর কিনার/ আমার অস্তিত্বে গাঁথা। আমি এই উধাও নদীর মুগ্ধ এক অবোধ বালক। (আমি কোনো আগন্তুক নই/ দু'হাতে দুই আদিম পাথর) *বিদীর্ণ দর্পণে মুখ* কাব্যের 'এই ব্যাপ্ত জনপদ' এবং 'আমি তাকে কবিতায়'ও জনজীবনের সঙ্গে কবির একাত্ম হবার আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত। এই যে তাঁর ভূমিপুত্র-পরিচয়ে বলীয়ান হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা, আত্মশক্তিতে স্বজন চিনে নেওয়ার প্রত্যয়— এটিই তাঁর কবিতার শক্তি, এবং এখানেই উপনিবেশবাদী শক্তির পরাজয়। ফানোঁ লিখেছেন, একটি ভূমিপুত্র যখন নিজের দলে ফিরে যেতে মনস্থ করে, তখন শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক কাঠামোর ব্যর্থতাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না, বরং এ পর্যন্ত যা যা করা হয়েছে তা অসাড় এবং দীনতার প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। প্রতিটি ভূমিপুত্রের দলত্যাগ এবং নিজদলে ফিরে যাবার এই অগ্রযাত্রা ঔপনিবেশিক শাসনের বিপক্ষে একটি বৈপ্লবিক বিদ্রূপ।

উপনিবেশবাদী নৈরাজ্যে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব যখন সংকটে পতিত হয়, উত্তর-উপনিবেশবাদী সাহিত্য নির্মাণের মধ্য দিয়ে ব্যক্তির সেই পরাভূত অস্তিত্ব পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চলে। পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া হিসেবে তখন আত্মশক্তি, আত্মপরিচয় নির্মাণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আহসান হাবীব তাঁর কবিতায় আত্মপরিচয়ের ক্ষেত্র নির্মাণ করে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠতে পেরেছেন বলেই শেষপর্যন্ত তিনি অস্তিত্বসংকট থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কলোনির বিরুদ্ধ প্রতিরোধ হিসেবে তিনি তাঁর কাব্যে 'সেলফ'কে এঁকেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। 'সেলফ'কে পড়তে পারা এবং তাকে আঁকতে পারা উত্তর উপনিবেশবাদী পরিপ্রেক্ষিতে সবচাইতে বড়ো প্রতিরোধকেই প্রতীকায়িত করে।

নগুগি ওয়া থিয়োঙ্গা তাঁর *ডি কলোনাইজিং দ্য মাইন্ড* (১৯৮৬) গ্রন্থে উপবিশকের ভাষা ও সংস্কৃতি যতটা সম্ভব বর্জনের কথা বলেছেন, সেইসঙ্গে উপনিবেশকের সংস্কৃতি প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশিতের নিজস্ব সংস্কৃতির ভিত্তি নির্মাণের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিতের রাজনীতি ও অর্থনীতির অগ্রগতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। উপনিবেশকের আধিপত্য বিস্তারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। তিনি তাঁর *ডি কলোনাইজিং দ্য মাইন্ড* গ্রন্থে বিচ্ছিন্নতার একটি প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখিয়েছেন স্কুলে মাতৃভাষা ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা তৈরি করে একটি শিশুর বিদ্যালয়ের ভাষা ও মাতৃভাষার ভেতর কীভাবে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করা হয়। একে তিনি 'ঔপনিবেশিক বিচ্ছিন্নতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই বিচ্ছিন্নতাই পরবর্তীকালে আরও সরব হয়ে জন্ম দেয় অস্তিত্বসংকটের। আহসান হাবীবের কাব্যের ভাষা তাঁর যাপিত জীবনের, একেবারেই আটপৌরে হলেও সহজ, সরল, এই সাধারণ শব্দও বোধের গভীরে নিয়ে যায়, ট্রিটমেন্টের গুণে আপাতবিচারে সামান্য তখন অসামান্য হয়ে ওঠে। ব্যবহারিক ব্যঞ্জনায় আটপৌরে কিছু গ্রামীণ শব্দকে তিনি যেমন অসামান্য করে তুলেছেন তেমনি কিছু শব্দকে নিজস্ব শব্দাবলিতে পরিণত করেছেন, যেগুলো তাকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করে (আহমদ, ১৯৯৫, পৃ. পনেরো)। এই ভাষা আর কবিতায় উঠে আসা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তাঁর একান্ত নিজের যা থেকে উপনিবেশবাদী আগ্রাসনে তিনি বিচ্ছিন্ন হননি। মাতৃভাষার সঙ্গে ব্যক্তির যোগ আত্মপরিচয়ের। কাজেই উপনিবেশ মানুষের ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই আত্মপরিচয়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে চায়। আহসান হাবীবের কাব্যভাষা উপনিবেশের এই নেতির সংস্কৃতিকে প্রতিরোধ করে একান্তই তাঁর যাপিত জীবনের ভাষাকে রূপায়িত করেছে। সমালোচক মন্তব্য করেন, 'আহসান হাবীব একদিকে যেমন তাঁর কবিতা দিয়ে 'বাংলাদেশের মানুষের স্বজন হয়ে উঠেছেন, ঠিক তেমনি এই স্বজনদের আলোকে বাংলা কবিতারও তিনি হয়ে উঠেছেন 'স্বজন একজন' (তুষার, ২০১৭, পৃ. ১০৯)। তবে, আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের আরেকটি চিহ্ন হলো উপনিবেশিক শক্তি কবি ও লেখকের চৈতন্যে উপনিবেশিকরণের প্রক্রিয়াকে চারিয়ে দিয়ে সংকরায়নের মাধ্যমে তার প্রবল উপস্থিতিকে জানান

দিতে চায়। আহসান হাবীব এই প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারলেও কোথাও কোথাও তাঁর কবিতা ঔপনিবেশিক প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি। *রাত্রি শেষ* কাব্যের 'কাশ্মিরী মেয়ে' কবিতায় কাশ্মিরী মেয়ের প্রতি তাঁর প্রেমের প্রকাশে, কিংবা, কবিতার শিরোনামে 'ছহি জঙ্গেনামা' শব্দচয়নে অথবা, 'তোমাকে মৃত জেনে' কবিতায় আবু হোসেনকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে যুক্ত করার বিষয়গুলোতে তাঁর কবিতায় ঔপনিবেশিক শক্তির কিছুটা সংকরায়নের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

আহসান হাবীবের কবিতায় নানাভাবে উপনিবেশবাদী প্রতিরোধের বয়ান নির্মিত হয়েছে। দু' দুটো উপনিবেশের মুখোমুখি দাঁড়ানো সংবেদনশীল এই কবির মানসজগতে উপনিবেশায়নের চলমান ক্ষতের স্বরূপ উপলব্ধ হয়। ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের অনপনেয় আঁচড়, ঔপনিবেশিক সময়পটের গভীর আগ্রাসন এবং পরোক্ষভাবে পরবর্তীকালে তার চলমানতা আহসান হাবীবের কবিতায় দুর্লক্ষ্য নয়। এই দুর্মর ঔপনিবেশিক আগ্রাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও সেখানে ধ্বনিত। হাজার বছরের আবহমান বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য-স্বদেশ ও মৃত্তিকালগ্ন হয়ে ওঠার বাসনা তাঁর কবিতার মূল গন্তব্য, যার মধ্য দিয়ে তিনি উপনিবেশবাদী প্রতিরোধের বয়ান নির্মিত করতে সচেষ্ট। এ কালেও আর্থ-সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে যে নয়া উপনিবেশায়নের (Neo Colonisation) দৌরাত্ম চলমান, হাবীবের কবিতা তা প্রতিরোধে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর কবিতায় নির্মিত হাজার বছরের আবহমান বাংলার ঋদ্ধ ঐতিহ্য-সংস্কৃতির জগৎ উপনিবেশিত জাতিগোষ্ঠীর মনোজগতে বিপরীত বয়ান সৃজন করেছে, যার মধ্য দিয়ে উপনিবেশবাদী শক্তির পরাভবের জায়গাটিই চিহ্নিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশের কবিতায় এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন কালোত্তীর্ণ এক কণ্ঠস্বর।

সহায়কপঞ্জি

আহমদ রফিক। (২০১৩)। 'চল্লিশের কবিতা: স্বভাবে স্বরূপে'। নান্দীপাঠ, সংখ্যা পাঁচ, ঢাকা। পৃপৃ. ১-২৪

আহসান হাবীব। (১৯৯৫)। *আহসান হাবীব রচনাবলী ১*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

কুদরত-ই-হুদা। (২০২২)। *জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রকাশ: বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিতা*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

তুষার দাশ। (২০১৭)। *নিঃশব্দ বজ্র আহসান হাবীব-এর কবিতা*। প্রতীক, ঢাকা।

দিলারা হাফিজ। (২০০২)। *বাংলাদেশের কবিতায় ব্যক্তি ও সমাজ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

পথিক বসু। (১৯৯৩)। *বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ*, ১ম খণ্ড। প্রতিভাস, কলকাতা।

ফকরুল চৌধুরী। (২০২১)। *বিউপনিবেশায়ন* । ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।

ফয়েজ আলম। (২০০৬)। *উত্তর-উপনিবেশী মন*। সংবেদ, ঢাকা।

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী। (২০১৮)। *কবিতার শব্দ-সাঁকো*। নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

মাসুদুজ্জামান (২০১৪)। 'উত্তর উপনিবেশবাদী সাহিত্যতত্ত্ব'। *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, [সম্পা. বেগম আকতার কামাল], অবসর, ঢাকা। পৃপৃ. ২০৪–২২৬

মাসুদুজ্জামান। (২০২২)। *রবীন্দ্রনাথ একটি প্রাচ্যবাদী ও উত্তর উপনিবেশবাদী পাঠ*। অনন্যা, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (২০১৯)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। [সম্পা. সৈয়দ আজিজুল হক], কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

শাহেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ। (২০১২)। *আফ্রিকার কবিতা, বর্ণবাদ বা উপনিবেশ ভাঙার মাদল*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সাঈদ-উর-রহমান (২০১১)। 'বাংলাদেশের কবিতায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা'। হালখাতাঃ বাংলাদেশের কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধসংখ্যা। [সম্পা. শওকত হোসেন] এপ্রিল-জুন, ঢাকা। পৃপৃ. ২৫-৪৪

হিমাদ্রি লাহিড়ী (২০০৯)। 'ঔপনিবেশিকতাবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিকতাবাদ'। *পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা*। [সম্পা. নবেন্দু সেন], রত্নাবলী, কলকাতা। পৃপৃ. ৬২০–৬৩৭

হিমেল বরকত (২০১১)। 'বাংলাদেশের কবিতা', আধিপত্যের রাজনীতি'। হালখাতাঃ বাংলাদেশের কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধসংখ্যা। [সম্পা. শওকত হোসেন] এপ্রিল-জুন, ঢাকা। পৃ. ৪৫–৫০

Bowers, M. A. (2005). *Colonial Post Colonial Literature*, Oxford University Press, New York.

Fanon, F. (2008). *Black skin white masks*, Charles Lam Markmann [Trans.], Pluto Press, London.

Fanon, F. (1990). *The Wrethced of the Earth*, Constancefarrington, [Trans.], Penguin Books, London.

Smith, L. T. (1999). *Decolonizing Methodologies Research and indigenous peoples*, Zed Books Ltd, London & Newyork.